OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article – 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 238- 246
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 238 - 246
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস : প্রেমের স্বরূপ ও চেতনার স্বতন্ত্র পাঠ

স্বপন সুতার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : swapansutar24@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
Samaresh Majumdar, love and revolution, Subtle, Admirable, Conscious, Motivation, Conditional love, Fictional love.

Abstract
Samaresh Majumdar has highlighted the subtle aspects of love in several novels. As there were no restrictions in this regard, his interpretation never became obscene. Some of his famous love novels are 'Kalbela', 'Daybandhan', 'Niktakatha', 'Ferrari'. Different views of love can be observed here. It has a distinct lesson in consciousness. In the novel 'Kalbela' we see love and revolution together. As well as the struggle with society. This is a love story where love stays along with revolution. The author has given motivation to fight with it. Sometimes responsibility becomes another name for love. Samaresh Majumder shows how one can love another from taking responsibilities. He also showed that to judge people, it is not necessary to have eyes only, but also the vision of the mind. Sometimes the author starts with a fictional love story and ends it with a deep reality. The author conveys the spirit that love can only survive on a promise. Ever warned that just as love makes life full, its failure makes life hell. He encouraged to love yourself. If you can't love yourself, you can't love others. In the novel 'Mohini', the author explains what love really is. In the novel 'Ferrari' he explains again how terrible love can be if it depends on the appearance. People then become mere living skeletons. There is no price for immortality where there is no love. The author shows that pure love absorbs all inner impurities and purifies the heart. Ever shown love is unconditional. Somewhere again showed conditional love. Behind this condition, we can see how he fought against the social and political norms in his novel 'Niktakatha'. The author has made aware us here about how a person's ideals are destroyed due to government negligence. Love is a complex word which is impossible to explain in words. The way Samaresh Majumdar has made the impossible possible in his love novels is quite admirable. At the same time, he has also done social reform work. If there is no love, what is the permanence of man? He says never lose faith in love. Love forms the character of man, creates the conscious mind.

Discussion

সমরেশ মজুমদার সমকালীন রাজনৈতিক লেখালেখির পাশাপাশি একজন রোমান্টিক লেখক হিসেবেও বেশ জনপ্রিয়। তাঁর একাধিক লেখায় প্রেম মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলো তিনি তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখাগুলোতে যৌনতা নিয়ে যেমন কোনও অযথা বিধিনিষেধ ছিল না, তেমনই আবার সেই যৌনতার বিষয় কখনও অশ্লীলতার পর্যায়েও পৌঁছায়নি। প্রেমের জন্য বুদ্ধিদীপ্ত মানবিক পুরুষ ও সর্বংসহা নারীর যে অবয়ব তিনি গড়ে তুলেছেন তা ব্যতিক্রম। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত প্রেমের উপন্যাস হল— 'কালবেলা', 'নিকটকথা', 'দায়বন্ধন', 'এই আমি রেণু', 'লীলা-সুন্দর' 'সোনার শেকল', 'স্বপ্নেই এমন হয়', 'দিন যায় রাত যায়', 'মোহিনী', 'ফেরারী'। তাঁর এই উপন্যাসগুলো পড়ে আমরা প্রেমে পড়ি প্রেমের, প্রেমে পড়ি সাহিত্যের। যেন এক অচেনা জগৎ, যেখানে স্বচ্ছলতা-অস্বচ্ছলতা নেই, কোনও প্রতিযোগিতা, সংকীর্ণতা, প্রতিষ্ঠা-অপ্রতিষ্ঠার চিন্তা নেই, আছে কেবল মননশীলতার তৃপ্তি।

'কালবেলা' উপন্যাসটি বিপ্লবের একাধিক নতুন রূপের সঙ্গে জুড়েছে ভালোবাসার অনবদ্য কাহিনি। 'কালবেলা' অর্থাৎ অশুভ। লেখক একটা 'অশুভ' সময়ের কথাই বলেছেন এখানে। এটি একটি রাজনৈতিক প্রেমের উপন্যাস। মাধবীলতা এখানে বিপ্লবেরই আরেক নাম। তারা পূর্ণ হয়ে উঠেছিল একে অপরকে ভালোবেসে। মাধবীলতা অনিমেষকে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই ভাবেনি। লেখক এখানে দেখিয়েছেন বিপ্লব ও প্রেমও একে অপরের পরিপূরক হতে পারে। একটিকে বেছে নেওয়ার চেয়ে একসঙ্গে চললে তা অনেক বেশি সুখকর। তা অনিমেষ ও মাধবীলতার ভালোবাসাই প্রমাণ করে। বিপ্লব ও প্রেম তাদের পথচলার সঙ্গী।

অনিমেষ রাজনীতিতে সক্রিয় কর্মী। পার্টির জন্য সে সবসময় ব্যস্ত কিন্তু মাধবীলতা এ নিয়ে কখনও আফসোস করেনি। সে অনিমেষের কাজে কখনও বাধা হয়ে ওঠেনি কারণ অনিমেষের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। ভালোবাসার অর্থ সমর্পণ। রাধা কৃষ্ণকে যেভাবে সবকিছু সমর্পণ করেছিলেন, লেখক এখানে মাধবীলতাকে তারই প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেখিয়েছেন। সেই মোহে অনিমেষে সর্বক্ষণ বিভোর হয়ে থাকে। সে রাজনীতিতে পাশে না থাকতে পারলেও ছিল মানসিকভাবে। কমিউনিস্ট পার্টির উপর অনিমেষ নিজের আস্থা হারালে, মাধবীলতা তার পাশে দাঁড়িয়েছে, সৎযুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছে যেন সে এভাবে হঠাৎ করে সরে না আসে। এ কারণে মাধবীলতাকে এত ভালোলাগে অনিমেষের। মাধবীলতা তার সব দুঃখ-কষ্ট যেন মুহূর্তেই শোষণ করে নেয়। অনিমেষের আর্থিক সুরাহার জন্যই মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও মাধবীলতা চাকরির সিদ্ধান্ত নেয়। মাধবীলতাকে এর দামও দিতে হয় সমাজের কাছে। সমাজের কথা উপেক্ষা করে বাড়ি ছেড়ে সে হোস্টেলে চলে যায়। সমাজ তার কাছে গুরুত্বহীন। অনিমেষই শেষ কথা। এখানেই সমাজ ও ভালোবাসার কাছে মাধবীলতার চ্যালেঞ্জকে লেখক দেখিয়েছেন—

> "নিজের কাছে পরিষ্কার হলে পৃথিবীতে কে কী মনে করল তাতে কিছু এসে যায় না।"[১]

প্রকৃত ভালোবাসাই মানুষের মনকে পরিষ্কার চিন্তাভাবনা দিতে পারে, মনে সাহস জোগাতে পারে। এ সমস্তই মাধবীলতাকে অনিমেষের কাছে আরও স্বচ্ছ করে দিয়েছে। যে কি না সবকিছু ত্যাগ করেছে নিজের ভালবাসার জন্য, এর থেকে বড় অহংকারের আর কী থাকতে পারে! যদিও এতে অনিমেষের নিজেকে ভীষণ ব্যর্থ মনে হয়েছে। ব্যর্থ একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে, ব্যর্থ একজন প্রেমিক হিসেবেও। কিন্তু মাধবীলতা যেন তার সমস্ত ব্যার্থতাকে শুষে নিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে সবসময়। মাধবীলতা যখন অনিমেষকে বলে একদম মাথা গরম না করে সবকিছু তার উপর ছেড়ে দিতে তখন আমাদের মনে হয় ভালোবাসায় এর থেকে বড় প্রতিশ্রুতি আর নেই।

অনিমেষ মাধবীলতার ভালোবাসার কাছে সবক্ষেত্রেই পরাজিত। মাধবীলতাকে সমাজের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে একাই লড়তে হয়েছে। এমনকি পুলিশ যখন জেলে তাকে জেরা করার জন্য গর্ভবতী অবস্থাতেও মারধর করে তখনও শুধু অনিমেষের কথাই ভেবেছে সে, প্রেরণা দিয়েছে অনিমেষকে। অনিমেষ শেষে পঙ্গু হলেও মাধবীলতার ভালোবাসার কোনও পরিবর্তন হয়নি। অনিমেষের লজ্জা লাগলেও মাধবীলতা নিজের ভালোবাসার উজ্জ্বলতায় অনিমেষের সব অন্ধকার দূর করে দিতে চায়—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article – 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 238- 246
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না। আমি তো তোমার কাছ থেকে কিছুই চাইনি, কোনওদিন, শুধু তোমার জন্য কিছু করতে পারলে মনে হয় তা আমার জন্যই করছি, এইটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে কেন?"[২]

সন্তানের মুখ দেখে অনিমেষ তাদের সম্পর্ককে কাগজ কলমে স্বীকৃতি দিতে চায়। কিন্তু সে বোঝে না যে মেয়ে ভালোবাসার জন্য সমাজকে উপেক্ষা করে সন্তানকে বড় করতে পারে তার কাছে বিয়ের এই রেজিস্ট্রি কাগজের কোনও মূল্যই নেই—

> "অনিমেষ, আমাদের আইনসম্মত বা সামাজিক বিয়ে হয়নি। তুমি সেগুলো মানো কিনা জানিনা, এখন আমি নতুন করে তোমাকে বিয়ে করতে পারব না।"[৩]

মাধবীলতা অনিমেষকে লতার মতই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে রেখেছে। কখনও দিয়েছে জীবনে লড়াই করার সাহস, কখনও এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা, কখনও আবার ভালোবাসার শীতল স্নেহ। বিনিময়ে অনিমেষের থেকে কিছুই চায়নি সে। শিখিয়েছে ভালোবাসাই জীবনের প্রকৃত অর্থ।

ভালোবাসা ভীষণ জটিল। রূপের থেকে অনুভূতির প্রাধান্যই বেশি। কখনও সেই অনুভূতি আনে দায়িত্ববোধ, কখনও আবার সেই দায়িত্ববোধ থেকে সৃষ্টি হয় অনুভূতির। এ কথাই বলে গেছেন সমরেশ মজুমদার তাঁর 'দায়বন্ধন' উপন্যাসে। স্বাতীলেখা ও জয়দীপের ভালোবাসা এরই দোসর।

ভালোবাসার প্রথম ধাপই দায়িত্ববোধ। জয়দীপ নিজে না বুঝলেও কখন যেন স্বাতীলেখার প্রতি তার এই দায়িত্ববোধ এসে যায়। গর্ভবতী হয়েও যখন স্বাতীলেখা নিজের ভালোবাসাকে প্রতিষ্ঠা করতে মরিয়া হয়ে ওঠে তখন জয়দীপের মনে এক অজানা অনুভূতি জন্মায় স্বাতীলেখার প্রতি। স্বাতীলেখাও এই প্রথম সাহস পায় জয়দীপকে বিশ্বাস করতে। স্বাতীলেখার একার লড়াইয়ে যখন জয়দীপ আসে অনেক নিরাপদ অনুভব করে সে নিজেকে। এই অনুভূতি জয়দীপকে পুরোপুরি পালটে দেয়। যে জয়দীপ স্বাতীলেখাকে প্রথম দেখেই বলেছিল তার পেটের সন্তান নিছক কামনারই ফসল স্বাতীলেখার সঙ্গ তার মনে এনেছে ভালোবাসার উপলব্ধি। সে কারণেই জয়দীপ তার ভুল বুঝতে পারে, দৃষ্টি স্পষ্ট হয় তার। যে দৃষ্টি দিয়ে মানুষের মনকে পরিণত করে, প্রকৃত মানুষকে চিনিয়ে দেয়। তবে বেশিরভাগ মানুষের এই দৃষ্টি না থাকায় স্বাতীলেখা অথবা মাধবীলতাদের সমাজ মেনে নিতে কুণ্ঠা বোধ করে—

> "একটা টিউমার শরীরে অবাঞ্ছিত হলে যে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়, এ নিশ্চয়ই তার চেয়েও বেশি। টিউমারের কথা পাঁচজনকে বলা যায়, এটা যায় না। আজ বিকেল থেকে কামরার যেসব যাত্রী যাতায়াত করেছে, তাদের দৃষ্টির স্বাতীলেখার ওপর পড়েছে। আর সেই দৃষ্টিতে রূপমুগ্ধতা যেমন ছিল তেমনই কামনাও প্রকাশ পেয়েছিল কয়েকজনের চোখে। অথচ ওরা কেউ জানে না স্বাতীলেখার ভেতর শরীরের কথা। জানলে মুগ্ধতা নিশ্চয়ই উধাও হয়ে যেত।"[৪]

মানুষকে বিচার করার এ এক এমন সত্ত্বা যেখানে মানুষ মানুষকে শুধুমাত্র রক্তমাংসের চোখ দিয়েই দেখে। মনের দৃষ্টি তাদেরই থাকে যাদের মনে কামনার নয়, ভালোবাসার অনুভূতি থাকে।

স্বাতীলেখার মনে হয় জয়দীপ দায়ে পড়েই এই সমস্ত কর্তব্য করে চলেছে। কারণ বারবার তার মনে এসেছে যে সে অন্যের সন্তান ধারন করে কী করে প্রকৃত ভালোবাসা পাবে? জয়দীপকে তার ভালোবাসতে ইচ্ছা করলেও এই কুণ্ঠাবোধেই সে তা পারছে না—

> "একজন গর্ভবতী মহিলাকে কোনও বাঙালি যুবক কোন দুঃখে ভালবাসতে যাবে। ... কিন্তু একজন স্বার্থহীন মানুষকে তো এই ডামাডোলে দেখতে পেলাম।"[৫]

আসলে লেখক এখানে সমাজের এক ভয়ঙ্কর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। অবিবাহিত গর্ভবতী সমাজে যে কতটা পরিত্যক্ত, অবহেলিত এবং মানুষকে বিচারের এটা যে কোনও মাপকাঠিই নয় সেই চেতনার পাঠই লেখক এখানে দিয়ে গেছেন। নতুন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article – 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 238- 246
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এক ভালোলাগা তৈরি হয় তাদের। স্বাতীলেখাও জয়দীপের ভালোবাসার স্পর্শ অনুভব করতে পারে। নিছক কর্তব্যের খাতিরে কেউ কাউকে এত আগলে রাখতে পারে না। দু'জনে দু'জনার দায়ভার বইতে বইতে ভালোবাসার আবরণ কখন যেন তাদেরকে ঘিরে ফেলে। রাস্তাঘাট, মানুষজন, পুলিশ, ট্যাক্সি সব এক থাকলেও এই অচেনা শহরটায় মন ভরে মুক্তির স্বাদ নিতে রওনা হয় তারা।

পাওয়াতেই প্রেমের সার্থকতা সম্পূর্ণ নয়। ভালোবাসার কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা হয় না। কেউ বিয়ে করে সঙ্গীকে সারাজীবনের জন্য পাওয়াতে ভালোবাসা খুঁজে পায়, কারও কাছে ভালোবাসায় বিয়েটা গুরুত্বহীন। কখনও দেখি অপেক্ষারই দোসর ভালোবাসা, কখনও আবার আত্মসমর্পণ মানেই প্রেম। এমনই এক উপন্যাস 'এই আমি রেণু' যেখানে সমরেশ মজুমদার আত্মসমর্পণকেই ভালোবাসার দোসর হিসেবে দেখিয়েছেন। জানতে পারি পাওয়ার আশা না থাকলেও আছে ভালোবাসার সেই অনুভূতি যেখানে সমর্পণই মূল প্রেরণা।

রেণু সুমিতকে প্রস্তাব দেয় পাঁচ বছর অপেক্ষা করার। অপেক্ষা করবে বলে আশ্বাসও দেয় সুমিত। কিন্তু বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেদিন রেণু আসতে পারেনি। যে ভালোবাসার দোহাই দিয়ে রেণু সুমিতকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে যায় সেই ভালোবাসি শব্দটা কিন্তু সুমিতের থেকে দূরে যায়নি। সযত্নে আগলে রাখে রেণুর ভালোবাসাকে। শুধুমাত্র একটি চিঠি তার শেষ সম্বল। এ চিঠি রেণুর। যে চিঠি খুলতেই একরাশ শিউলি ফুলের গন্ধে ভেসে ওঠে রেণুর মুখখানা। রেণু বরাবরই ভালোবাসার কাঙাল ছিল। ভালোবাসার প্রকৃত অনুভূতি কখনওই তার মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। সুমিত যেখানে রেণুর সমস্ত অতীতকে অগ্রাহ্য করে রেণুকে ভালোবেসেছে রেণু কিন্তু তা পারেনি। বিয়ের পর রেণু তার কাছে এলেও সুমিতের হাত সে ধরতে পারে না। কী জবাব দেবে সে নিজের ভালোবাসার কাছে! তাই সে তার স্বামীকেই বেছে নিয়েছে। চিঠিটা পুড়িয়ে সুমিতও নিজের শেষ সম্বলটুকু সমর্পণ করে রেণুর সুখের কথা ভেবে। উভয়ই নিজেদের সমর্পণে প্রতিষ্ঠা করে এক বিশুদ্ধ চাওয়া-পাওয়াহীন ভালোবাসার।

সমরেশ মজুমদার 'স্বপ্নেই এমন হয়' উপন্যাসে আশ্চর্য এক ফ্যান্টাসি প্রেমের কাহিনি তুলে ধরেছেন। কাল্পনিকতার মধ্যে দিয়ে অদ্ভুত এক রোমান্সে যেভাবে তিনি ভালোবাসার মর্ম কাহিনিতে উপস্থাপন করেছেন তা যথেষ্ট শিক্ষণীয়।

মিলন যে দ্বীপের দেখাশোনা করে সেখানের একটি পরিত্যক্ত লঞ্চে ডায়েরিটা বহুবছর অতিক্রম করে এখনও ভালোবাসার প্রতীক হয়ে রয়েছে। যে ডায়রি পড়তে পড়তে মিলন অন্যরকম সুখ পায়, ভালোবাসার অনুভূতি জাগে তার মনে। পরদিনই সেই দ্বীপ ঝড়ে তছনছ হয়ে যায়। এর মাঝেই তার জীবনে প্রথম নারী ঝিনুকের প্রবেশ। আবারও আরেকটা ভালোবাসার কাহিনির সাক্ষী এই পরিত্যক্ত লঞ্চটি। ঝড়-বৃষ্টিতে ঝিনুক যখন মিলনকে জড়িয়ে ধরে তখন অদ্ভুত এক রোমান্টিক পরিবেশে তারা একে অপরের কাছে আসার সুযোগ পায়। তবে মিলনের এই প্রেম ডায়রিতে পড়া মুরহেড ও সাবিতানির প্রেম কাহিনির মতো নয়। খানিকটা আলাদা অনুভূতি। মিলন চিরকালের জন্য ঝিনুকের ভালোবাসায় ডুব দিতে চায়—

> "দু'টো হাত দু'পাশে ছড়িয়ে চিৎকার করল মিলন। হে আকাশ বাতাস, হে সূর্য, হে গাছেরা, সমুদ্র তোমাদের সবাইকে সাক্ষী রেখে আমি ঘোষণা করলাম ঝিনুক আমার স্ত্রী।"[৬]

যে মাধবীলতা ভালোবাসার জন্য বিয়েকে উপেক্ষা করেছিল এখানে তার সঙ্গে ঝিনুকের ভালোবাসার বিস্তর তফাৎ। সে চায় সামাজিক বিয়ে। সে কারণেই মিলনকে ছেড়ে সে চলে যায় তার বাবাকে রাজি করাতে। শুধু যাওয়ার সময় বলে যায়, তাকে ভুলে না যায়। মিলন এরপর সম্পূর্ণ একা হয়ে যায়। ঝিনুকের প্রতিশ্রুতি তার এই একাকীত্ব দূর করতে পারে না। সে কারণেই মিলন দ্বিতীয়বার প্রেমে পড়ে। হাসি তার জীবনের দ্বিতীয় নারী। সবকিছুই প্রায় অবিকল চলতে থাকে তাদের মধ্যে। লঞ্চে যাওয়া, দুজনের দুজনকে পছন্দ করা। কিন্তু এ সবের মধ্যে সে ঝিনুককে দাওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে যেতে থাকে। একটা সামান্য প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার চেয়ে হাসির সঙ্গে শরীরের মিলনে অনেক বেশি সুখকর তার কাছে। সে কারণেই

ঝিনুকের বিরুদ্ধে মনে মনে একের পর এক অভিযোগ আনে মিলন। ঝিনুক মিথ্যেবাদী, আদৌ সে সতী কি না। অতীতের ভালোবাসাকে অস্বীকার করে সে বেছে নেয় বর্তমানকে।

ভালোবাসা কেবলমাত্র সাময়িক অনুভূতি নয়। তা অন্তরের স্থায়ী শিখা। যে প্রতিশ্রুতিকে উপেক্ষা করে মিলন হাসিকে বেছে নেয় অনেকের কাছে আবার ওই প্রতিশ্রুতিটুকুই যথেষ্ট সারাজীবন বেঁচে থাকার জন্য। মিলন না অতীত না বর্তমান কাউকেই প্রকৃত ভালোবাসতে পারেনি। সে কারণেই যখন সে জানতে পারে হাসি গর্ভবতী মুহূর্তে মিলনের ভালোবাসা ফ্যাকাশে হয়ে যায়—

> "সর্বনাশ উঠে বসল মিলন। মেয়েটার পেটে বাচ্চা এসে গেছে। এ ক'দিনে সে বিন্দুমাত্র টের পায়নি। হয়তো চার কি পাঁচ মাসের ভ্রুন ওর পেটে। বাইরে থেকে যা বোঝা যায়নি, হাত সরিয়ে নিল মিলন।"[৭]

কেবল গর্ভবতী হওয়ার কারণে যে ভালোবাসা মিলনের মন থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল তাকে আদৌ ভালোবাসা কি বলা যায়। যে শরীরকে আঁকড়ে মিলন শারীরিক ক্ষুধা নিবারণ করেছিল সে শরীরকে ছুঁয়েই সে অনুভব করতে পারে না, কী অসহায় অবস্থায় চারজন মিলে হাসিকে ধর্ষণ করেছে। যে ভালোবাসায় হাসির ঠাই পাওয়ার কথা ছিল তা না পেয়ে অবজ্ঞায় সে সমুদ্রে ঠাই নিল। মিলন না পারল ঝিনুকের ভালোবাসায় আস্থা রাখতে না পারল হাসিকে পূর্ণতা দিতে। এখন কাল্পনিক ভালোবাসাই তার শেষ সম্বল।

ভালোবাসা যেমন জীবনকে পূর্ণতা দেয় তেমনই তার ব্যর্থতায় জীবন নরক হয়ে ওঠে। এই সতর্কবাণী দিয়েই 'দিন যায় রাত যায়' উপন্যাসে লেখক আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নিজেকে বোঝা, নিজেকে ভালোবাসা।

পরপর দুটো ভুল তিস্তার জীবনীশক্তি কেড়ে নেয়। বঞ্চনা ও প্রবঞ্চনার মধ্যে দিয়ে নিজেকে খোঁজার লড়াই তার প্রথম থেকেই চলতে থাকে। নিস্পাপ ও পবিত্র মনে সে কলেজে সুমিতকে ভালোবেসেছিল। পড়াশোনা ছেড়ে বাবার কথা অমান্য করে সে সুমিতকে বিয়ে করে। সংসার চালাতে টিউশনির পথ বেছে নেয় সে। আর একবেলা খাওয়া। বিনিময়ে সে সুমিতের থেকে পায় শুধুই প্রতারণা। কিন্তু কে বুঝতে পারে তা আগে থেকে। কারণ ভালোবাসার থেকে পবিত্র জিনিস আর নেই—

> "মানুষ যখন ভালোবাসে তখন ঈশ্বর তাকে ভবিষ্যত দেখতে দেন না কেন? এ কেমন জুয়া খেলা।"[৮]

সে কারণেই তিস্তা তার সবটা দিয়ে দেয় সুমিতকে। কিন্তু এ কেমন ভালোবাসা যেখানে তার স্বামী তাকে বেঁচে দিতে চায়! এমনকি মুখে অ্যাসিড মারারও হুমকিও দেয়। অগত্যা এই মিথ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক থেকে বেড়িয়ে আসে তিস্তা। কিন্তু দ্বিতীয়বার বিয়ে করেও সে প্রকৃত ভালোবাসা পায় না। অরিত্র হয়ে ওঠে তিস্তার জীবনের দ্বিতীয় সংগ্রাম। অরিত্র ও তিস্তার সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর হলেও ভালোবাসা সেখানে ছিল না। তিস্তার মনে ভালোবাসার অনুভূতি থাকলেও অরিত্রর কাছে এ অনুভূতিহীন দাম্পত্য জীবন। তিস্তার সুন্দর ফুটফুটে একটি মেয়ে হয়। ভালোবাসা তার মনকে এতটাই বিষিয়ে তোলে যে ভালোবাসার থেকেই তার বিশ্বাস উঠে গেছে। নিজের মেয়েকে দেখে তাই বারবার সে ভাবে আবারও একটি মেয়েকে পৃথিবীতে টিকে থাকার লড়াইয়ে নামতে হবে। কিন্তু কেন অরিত্র তাকে ভালোবাসতে পারেনি এর জবাব পাই কাহিনির শেষে। অরিত্রর প্রথম স্ত্রী নীলিমা সেন। অরিত্র এখনও সেই বন্ধনেই আবদ্ধ। তিস্তা কোনও দিনই তার ডিভোর্স পেপার চায়নি। ভালোবেসে দ্বিতীয়বারের জন্য ঠোকেছে তিস্তা। নিজেকে তার কেবল রক্ষিতাই মনে হয়েছে। একরকম ফাঁদে ফেলেই অরিত্র তিস্তাকে দিয়ে ডিভোর্স করায় অরিত্র যাতে সে নীলিমার সঙ্গে থাকতে পারে। অরিত্রকে সে ভালোবেসেছিল তাই তাকে মুক্ত করে দিয়েছে তিস্তা। কিন্তু ভালোবাসার এ কেমন পরিণতি! আসলে সমরেশ মজুমদার এখানে একটি নেতিবাচক দিককে কেন্দ্র করে মানুষকে দিয়েছেন বেঁচে থাকার প্রেরণা। এখন আর কষ্ট পায় না তিস্তা—

> "নিয়মমাফিক জীবনে যদি হঠাৎ ছেদ পড়ে তাহলে সে দ্বিতীয় রাস্তা খুঁজে নেয় সেটাকে চালু রাখতে।"[৯]

তার মেয়ে টিয়ার মধ্যে সে নিজেকে খুঁজে পায়। সন্ধান পায় দ্বিতীয় রাস্তার। কখনও যা পারেনি তিস্তা এবার তা পারবে। এখন সে কেবল নিজেকে ভালোবাসবে।

ভালোবাসা আসলে কী? এর কি কোনও পরিধি হয়? তা কি কেবলমাত্র মানুষে মানুষে হয়? এ সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের সমাধান করে গেছেন সমরেশ মজুমদার তাঁর 'মোহিনী' উপন্যাসে। আশার জীবনে ঘটা নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমরা ভালোবাসার এক নবরূপ খুঁজে পাই। ঈশ্বর যার শরীরে স্থায়ী অসুখের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, বিছানাই যার সবসময়ের সঙ্গী সেই মেয়েও তার শারীরিক অক্ষমতাকে জয় করে নাচকে ভালোবেসে। একের পর এক বাঁধা অতিক্রম করে সে সফলতার শিখরে পৌঁছায়। নাচের প্রতি এই ভালোবাসাই তাকে নিয়ে যায় দক্ষিণ ভারতের কেরালায় কথাকলি নাচের কলামণ্ডলে। যে নৃত্যকলা কেবল পুরুষদের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল এই শীর্ণা ও রুগ্ন মেয়েও নাচকে ভালোবেসে তা জয় করল। তার মধ্যে এত আত্মবিশ্বাস এসেছে শুধুমাত্র নটরাজের প্রতি পবিত্র ভালোবাসায়।

ভালোবাসায় আমরা শিখি ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করতে। শিখি ধর্ম-অধর্মের ভেদাভেদ, ন্যায়-অন্যায় বিচারের ক্ষমতা। নাচকেই আশা নিজের জগৎ, নিজের ভালোবাসায় পরিণত করেছিল। তাই নাচকে বিক্রি করতে সে নারাজ। এ কারণেই তার জীবনের প্রথম ভালোবাসার প্রস্তাবকে সে প্রত্যাখ্যান করেছিল—

> "তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমি আমার নুপুর খুলে ফেলতে পারি, জীবনে আর কখনও আমি নাচব না, কিন্তু গুরুর আদেশ অমান্য করে নাচ বিক্রি করব না তোমার সাধ মেটাতে।"[১০]

আমরা সাধারণত বিবাহ বলতে কী বুঝি? মন্ত্র, পূজা বা পরিবারের সাক্ষ্য? সমরেশ মজুমদার আমাদের বিবাহ বন্ধনের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়েছেন। এ কাহিনির মাস্টারমশাই এবং মীনাক্ষীর বিবাহ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—

> "আমরা পরস্পরের সততার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে ভালবাসার মন্ত্রে বিবাহিত হয়েছিলাম।"[১১]

প্রকৃত ভালোবাসার বন্ধন এটি। নিছক সামাজিক স্বীকৃতি নয়, দুটো মনের স্বীকৃতি এখানে শেষকথা।

তীর্থর প্রেম প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে বুকের পাঁজরে যে মেঘ জমেছিল আশার তা একদিন উধাও হয় স্টেশনে তীর্থকে তার স্ত্রী-পুত্রকে দেখে। আশার মনে কোনও হিংসা জন্মায়নি তা দেখে। এটাই প্রকৃত ভালোবাসা, যেখানে ভালোবাসা নিজে না পেলেও ভালোলাগার মানুষটি যদি পায় তবে তার খুশিতেই নিজের মনে সুখ আসে। তবে আশার মন থেকে তীর্থর প্রতি ভালোবাসা এখনও মুছে যায়নি, ভরতনাট্যম নাচের সময় তার সামনে তীর্থের মুখ ফুটে ওঠাই তার ভালোবাসার প্রমাণ। আশা হয়তো নিজের অজান্তেই তীর্থকে ভালোবেসেছিল কিন্তু নাচের জন্য সেদিন তাকে গ্রহণ করতে পারেনি। এখন যখন তার সামনে তীর্থের মুখ ভেসে ওঠে তখন বুঝেছে যে সে শিল্পী থেকে মোহিনী হয়েছে—

> "রক্তমাংসের মানুষকে ভালবেসে মোহিনী হওয়া যায়, শিল্পী নয়।"[১২]

আর এখন থেকে সে একজন শিল্পী নয় বরং মোহিনী হয়েই বাঁচবে।

প্রেম শব্দটি হয়তো অনেকের কাছে কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য। কিন্তু সত্যি কি তাই? অবশ্যই না। কারও বাহ্যিক সৌন্দর্য আমাদের চোখে ভাল লাগলেই আমদের মন তাকে প্রেম হিসাবে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু প্রেম হল বায়ুর মতোই। বায়ু না থাকলে পৃথিবীতে যেমন প্রাণের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না তেমনই মানুষের মনে প্রেম না থাকলে মানুষের অস্তিত্বও থাকবে না। প্রেম ছাড়া মানুষ নিছক জীবন্ত কঙ্কাল। সমরেশ মজুমদার তাঁর 'ফেরারী' উপন্যাসে এমনই একটি পরিস্থিতির সামনে আমাদের দাঁড় করান। যেখানে প্রেম ছাড়া মানুষ মাংসহীন, অনুভূতিহীন জীবন্ত কঙ্কাল।

আজকাল আমাদের সমাজে প্রেম কেবলমাত্র শরীরের আকর্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ উপন্যাসে স্বপ্নেন্দুর মাধ্যমে লেখক তা দেখিয়েছেন। সে অফিসের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ে। হেনার শরীরই তার কাছে প্রেম করার জন্য যথেষ্ট—

> "হেনা সেন এই আটতলা অফিসের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা। সুন্দরী বললে কম বলা হবে। মহিলার শরীরে যেন ঈশ্বর মেপে মেপে জাদু মাখিয়ে দিয়েছেন। অমন সুন্দর গড়নের বুক এবং নিতম্ব এবং তার সঙ্গে মেলানো অনেকটা উন্মুক্ত কোমর দেখলেই কলজেটা স্থির হয়ে যায়।"[১৩]

কিন্তু শরীর স্থায়ী নয়। মনকেই সারাজীবন নিয়ে চলতে হয়। সেক্ষেত্রে শারীরিক প্রেমের স্থায়ীত্ব কতটুকু।
এই ভুলের জন্যই প্রকৃত প্রেম উধাও হয়ে যাচ্ছে সমাজ থেকে। কাহিনিতেও লেখক তাই দেখিয়েছেন। কলকাতা শহরের মানুষের বুক থেকে যেদিন প্রেম উধাও হয়ে গেল তখন পড়ে রইল কেবল জীবন্ত কঙ্কাল। নদীর জল, বন্যজন্তু, গাছপালা সবই মুক্তি পেয়েছে কিন্তু কঙ্কালরুপী মানুষের মুক্তি নেই। লেখক এখানে কাল্পনিকতায় আমাদের রোমহর্ষক চেতনা দিয়ে গেছেন—

> "শরীরে কোথাও মাংস নেই, রক্ত নেই, চামড়া নেই। এমনকী শিরা উপশিরা পর্যন্ত নেই। শুধু শরীরের খাঁচাটা আস্ত রয়েছে। আর শুনছে হৃৎপিন্ডের আওয়াজ। ঘড়ির মতো শব্দ করে চলছে সেটা।"[১৪]

এমন অমরত্বের লাভ কী! যেখানে ভালোবাসার উপলব্ধি নেই, নেই কোনও অনুভূতি। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভালোবাসার অনুভূতি অমরত্বের চেয়েও বেশি মূল্যবান। সব খুঁইয়ে স্বপ্নেন্দু বুঝতে পারে ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ। যে স্বপ্নেন্দুর কাছে এতদিন হেনার বাহ্যিক সৌন্দর্যই সবকিছু ছিল এখন সে হেনার অন্তরের সৌন্দর্যই দেখতে পায়। এই ভালোবাসা প্রকাশ করতেই স্বপ্নেন্দু একটি লাল গোলাপ কিনেছিল হেনাকে দেবে বলে। কিন্তু অহংকারের ঔদ্ধত্যে হেনা তা গ্রহণ করেনি। তাই স্বপ্নেন্দু গোলাপটিকে কাঁচের বাটিতে ঢেকে রেখেছিল। দূষিত বায়ু একমাত্র সেই গোলাপটিকেই স্পর্শ করতে পারেনি। বিশুদ্ধ ভালোবাসার প্রতীক হয়ে গোলাপটি তার শোভা বজায় রাখতে পেরেছে। এমন একটা পরিস্থিতি যেখানে মানুষের না আছে ঘুম, না আছে মনে শান্তি, সেখানে গোলাপটিকে দেখে স্বপ্নেন্দু চরম স্বস্তি পায়। হেনা ও আত্রেয়ী স্বপ্নেন্দুকে পাওয়ার প্রতিযোগিতায় নামলেও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা তাদের কারোরই ছিল না। সে কারণেই স্বপ্নেন্দু তাদের কাউকেই জীবনসঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেনি। এরচেয়ে তার কাছে গোলাপটি অনেক বেশি দামী, ভালোবাসার জীবন্ত প্রতীক। তাই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দিয়ে যখন গোলাপটিকে সে আঁকড়ে ধরে তখন সেই বিশুদ্ধ প্রেম স্বপ্নেন্দুর শরীরের সমস্ত দূষিত বায়ুকে শুষে তাকে ভালোবাসার ছোঁয়ায় এই মৃত্যুহীন নরক জীবন থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত করে দিয়েছে। এই রকম একটা অভাবনীয় কল্পনার মধ্যে দিয়ে লেখক আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে গিয়েছেন। শিখিয়েছেন মনকে বিশুদ্ধ করে ভালোবাসার চেতনা।

ভালোবাসা কখনও শর্তসাপেক্ষ, কখনও শর্তহীন। 'কালবেলা'-য় যেমন দেখা যায় মাধবীলতা সব কিছুর সঙ্গেই লড়াই করতে রাজি কিন্তু সে কিছুতেই অনিমেষকে পরিবর্তন করতে চায়নি। অনিমেষের আদর্শকে নিজের অহংকার করে নিয়েছে। আবার 'নিকটকথা'-য় দেখি বিপ্লব হেনার ভালোবাসা পাবে যদি সে নিজের মতাদর্শের পরিবর্তন করতে পারে। কোনটা তবে বিশুদ্ধ প্রেম?

বিপ্লব প্রায় বেকার ছেলে। তবুও সে চায়নি নিজের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে বাবার তোষামোদে রাজনীতিকে কাজে লাগিয়ে রোজগারের ব্যাবস্থা করতে। সামান্য প্রুফ রিডারের কাজেই সে খুশি। এই কারণেই হেনার ভালোবাসাকে সে উপেক্ষা করেছে, তবুও তার মন থকে ভালোবাসা সম্পূর্ণ উধাও হয়ে যায়নি। একবছর পর আবার দেখতে ইচ্ছে করে হেনাকে, কাছে পেতে ইচ্ছে করে তার ভালোবাসাকে। হেনা এখনও ভালবাসে বিপ্লবকে কিন্তু কোনও কিছু কম্প্রোমাইজ করে তাকে গ্রহণ করতে পারবে না। তবে পৃথিবীতে কেউই ভালোবাসা ছাড়া বাঁচতে পারে না, বিপ্লব ও এর ব্যাতিক্রম নয়—

> "স্রোতের উল্টোদিকে সাঁতার কাটলে বেশিক্ষণ ভেসে থাকা যে যায় না, তা এতদিনে টের পেয়েছি।"[১৫]

আদর্শের বদলে সে ভালোবাসাকে বেছে নিয়েছে। কিন্তু কেন সে আদর্শ ও প্রেম দুটোকেই বেছে নিতে পারল না? আপাতদৃষ্টিতে আমরা এর জন্য হেনাকে দায়ী করলেও আসলে তা কিন্তু নয়। আসলে ভালোবাসা নয় পরিস্থিতি মানুষকে পরিবর্তনে বাধ্য করে। কেবল আদর্শ নিয়ে সমাজে বেঁচে থাকা যায় না। হেনা কথায় তা আরও স্পষ্ট হয়—

> "ক'টা টাকা রোজগার কর তুমি? তোমার ওই আদর্শ বাধ্য করবে তোমাকে আধপেটা খেয়ে থাকতে। ঝুপড়িতে থাকা মানুষের শান্তিটুকুও আমি পাব না। অথচ তুমি শিক্ষিত, রবীন্দ্রনাথ থেকে শেক্সপীয়র পড়া মানুষ। কিন্তু কতটুকু তোমার দাম?"[১৬]

হেনার জবানীতে লেখকের প্রত্যেকটি কথা যেন সমাজব্যবস্থা, সরকারি পরিকাঠামোকে করাঘাত করে। সমকাল থেকে এখনও পর্যন্ত দেশ-সমাজের এই চিত্র অপরিবর্তিত। সমরেশ মজুমদারের এই ব্যঞ্জনা অতীত থেকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও চেতনা দিয়ে যাবে, যতদিন না তা পরিবর্তিত হবে।

ভালোবাসা একটি সেনসিটিভ শব্দ। ভাষায় যার প্রকাশ প্রায় অসম্ভব। কিন্তু সমরেশ মজুমদার এই অনুভূতিকে তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে যেভাবে পরিবেশন করেছেন খুব সহজেই তা সর্বজনীন হয়ে ওঠে। তাঁর চরিত্রগুলোর মধ্যে আমরা যেন নিজেদের দেখতে পাই। সম্পর্কের সমস্যাগুলো চিহ্নত করে তিনি বারবার আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। ভালোবাসা জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। তার অপব্যবহার কিংবা অভাবে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, এই আগামবার্তা রয়েছে লেখকের প্রতিটি লেখায়। তাই লেখাগুলো এখনের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতেও প্রাসঙ্গিক থাকবে। এখনকার জীবনযাপনে আমরা সবেতেই ব্যস্ত। প্রেমের ক্ষেত্রেও তাই। এখন প্রেম হয় সোশিয়্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন সাইটে ছবি আর প্রোফাইলের ভরসায়। কখনও গাড়ি বাড়ি দেখেই প্রেম চলে আসে। সকলেই প্রেম চায় খাঁটি অথচ তা বিচারের মাপকাঠি কী? তা জানা নেই। এ কারণেই এখন প্রেমে এত ব্যর্থতা, দাম্পত্য জীবনে এত ডিভোর্স হয়। কেউ কাউকে হয়তো বোঝার চেষ্টা করে না। কমিউনিকেশন গ্যাপ মেটানোর চেয়ে বিকল্পতা খুঁজে নেওয়া অনেক বেশি সোজা। কিন্তু ভাবি না তার স্থায়িত্ব কতটুকু। এ কারণেই প্রেম শব্দটির প্রতি তিক্ততা চলে আসে, ভালোবাসার প্রতিও বিশ্বাস উঠে যায়। এভাবেই যদি প্রকৃত প্রেম সমাজ থেকে মুছে যেতে থাকে তাহলে মানুষ পরিণত হবে কেবলমাত্র আত্মাহীন জীবন্ত কঙ্কালে।

সমরেশ মজুমদার তাঁর উপন্যাসগুলোতে যেভাবে প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন তা কেবল যথার্থই নয়, বাস্তবিকও বটে। তাতে যেমন রয়েছে বিশুদ্ধ প্রেমের প্রতিচ্ছবি, তেমনি রয়েছে সময়ান্তরের ব্যঞ্জনা। যা আমাদেরকে আরও সচেতন করে।

Reference:

১. মজুমদার, সমরেশ, উপন্যাস সমগ্র ২, আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৬, চতুর্থ মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ৫২৭

২. তদেব, পৃ. ৭৩৬

৩. তদেব, পৃ. ৭৩৬

৪. মজুমদার, সমরেশ, দায়বন্ধন, আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১৩২

৫. তদেব, পৃ. ১৫৪

৬. মজুমদার, সমরেশ, লীলা-খেলা, পত্র ভারতী ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ২২৪

৭. তদেব, পৃ. ২৫০

৮. মজুমদার, সমরেশ, দিন যায় রাত যায়, আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ৫১

৯. তদেব, পৃ. ১১

১০. মজুমদার, সমরেশ, উপন্যাস সমগ্র ৪, আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০২২, পৃ. ২৫৭

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article – 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 238- 246
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১১. তদেব, পৃ. ২৭৪
১২. তদেব, পৃ. ২৭৭
১৩. মজুমদার, সমরেশ, উপন্যাস সমগ্র ৩, আনন্দ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১১৭
১৪. তদেব, পৃ. ১৫৮
১৫. মজুমদার, সমরেশ, সাতটি প্রেমের উপন্যাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ: ২০১৯, পৃ. ১৭১
১৬. তদেব, পৃ. ১৬৯